সাম্প্রদায়িক অপশক্তি বনাম স্থীতিশীল উন্নয়ন

মো: তৈয়ব আলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যখন একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে, ঠিক তখনই জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং একটি মহল দেশ ও বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমরা স্বপ্ন দেখি একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থান ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, মন্ত্রী হয়েছিল, পতাকা পেয়েছিল। সেই অপশক্তি আজও সক্রিয় এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত। এরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশে রক্তের গঙ্গা বইয়েছে, বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায়ে লিপ্ত থেকেছে।

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও সক্ষমতাসহ ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকারের সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর আঘাত আসে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দেশের জন্য অপমানজনক। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ পেয়েছি। এ প্রাপ্তিকে ধরে রাখা দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের দায়িত্ব।

আবহমানকাল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য মডেল বাংলাদেশ। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর প্রীতিময় মেলবন্ধনের কল্যাণে সাম্প্রদায়িকতা কখনও এদেশে আঘাত হানেনি। মানুষের শান্তি ও কল্যাণ সকল ধর্মের মূলবাণী হলেও অনেকেই এ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য নেতিবাচক সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছে। যুব সম্প্রদায়কে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতে করে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে গড়া স্বাধীন বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম দিক ধর্মীয় স্বাধীনতা। বাংলার নিজস্ব চিরায়ত ঐতিহ্য এবং অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির পরিপন্থী হলো উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরায়ত আমাদের এ ঐতিহ্যকে দলমতধর্মবর্ণনির্বিশেষে লালন করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তির একযোগে ঘুরে দাঁড়ানোর এখনই সময়। সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং এদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনতে হবে, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। তবে কোনো নিরীহ লোক যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে দিকে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে। অতি সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের পুজাকে কেন্দ্র করে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে ভবিষ্যতে যাতে কেউ এরকম ঘটনা ঘটাতে সাহস না পায় সে দিকে সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

গত বছর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যে তান্ডব চালিয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনার অতীত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগেও অন্তত চারবার এমন কান্ড ঘটিয়েছিল এই মৌলবাদী চক্র, সেই ঘটনা ঘটে ১৯৯৮, ২০০১, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে সর্বশেষ ২০২১ সালে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সারা দেহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দেওয়া হয়। সেখানে যেন শুধুই পোড়া গন্ধ। ধর্মপ্রাণ মানুষ কীভাবে এ ধরনের তান্ডব চালিয়ে দেশ ও দশের সম্পদ ধ্বংস করে মানুষের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারে তা বিবেকবান মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়ে থাকবে। সেদিনকে ঘিরে যা হয়েছে বা ঘটানো হয়েছে তা বাংলাদেশের সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বাংলার চিরায়ত ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে আঘাত করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ত্বরিৎ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলেও দেশের সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কয়েকজন মানুষকে আত্মহুতি দিতে হয়েছে।

২০১৬ সালে গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ধর্মান্ধ জঙ্গিদের আক্রমণের পর প্রশাসন যে শক্ত অবস্থান নিয়েছিল তাতে জনগণ সন্তুষ্ট। এ ঘটনায় বাংলাদেশ, জাপান, ইতালিসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিকরাও নিহত হয়েছিলেন। কলঙ্ক লেপে দিয়েছে বাংলাদেশের লাল-সবুজ মানচিত্রে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। সরকার প্রধানের সময়োচিত সিদ্ধান্তের কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও পর্যটকরা ফের বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও উগ্রবাদী ধর্মান্ধগোষ্ঠী যাতে হলি আর্টিজানের মতো ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্য জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেও ধর্মীয় উগ্রবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। সম্প্রতি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু 'প্রোজেক্ট সিন্ডিকেটে' তাঁর এক ব্লগে লিখেছেন যে, 'এই অপশক্তিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাগে রেখেছেন বলেই দেশটির উন্নয়নের গতি রেখা এমন বাড়ন্ত।' তিনি আরও লিখেছেন যে, 'যেসব দেশ এ কাজটি করতে পারেনি সেসব দেশে উন্নয়ন গতিময় হতে পারেনি।' এই বিচারেও বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা খুবই জরুরি। সাধারণ মানুষের ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যই এ নীতি অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপন এবং জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকীর সমাপনী পর্যায়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন আমরা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করি সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্প আমরা উপড়ে ফেলবো, জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলবো এবং দেশকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করবো, আবহমান বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখবো।

#

লেখক: পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা